আমার অন্তরে রাখো তোমার অন্তিম অধিকার...

সুদীপ সিংহ

'একা একা এতদিন কেটে গেল এখন দুখের নিশা প্রভাত হল।
আর না জ্বালা সব'
দুজনে এক হব
সোহাগে সদা রব ঢল ঢল।
তাহারি মুখ চেয়ে যামিনী যাবে বয়ে
নিবাব তারি প্রেমে হৃদি-অনল।'

বিবাহের পক্ষে এই গানটি গেয়েছিনে রবীন্দ্রনাথ, বিবাহঘটিত একটি গীতিনাটিকায়। বিপক্ষের গায়ক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সেটা মনে থাকলেও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর মনে নেই নাটিকাটির অভিনয় 'মানময়ী'র আগে না পরে। একটা সূত্র পাওয়া গেল তবে। মানময়ীর প্রথম প্রকাশ ১৮৮০ সালে, অতএব আমরা ধরে নিতে পারি বিবাহের হয়ে হওয়াল করে গানটি গেয়েছিলেন অবিবাহিত রবীন্দ্রনাথ। সারাজীবন ধরে সৃষ্টি করেছেন তিনি আর সেই সৃষ্টির আনন্দকে ভাগ করে নেওয়ার জন্য সবসময় পাশে চেয়েছেন কাউকে। রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন– 'কবিতা বা গানের মধ্যে দিয়ে মনের গভীর অনুভূতিকে প্রকাশ করতে যেটুকু না বলা যায়, সে-টুকু বলার জন্য সারাজীবন রবীন্দ্রনাথের এমন একজনকে প্রয়োজন হয়েছে...।'

তবে ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় কিছুটা দেরিতেই কাটল একা থাকার দুখনিশা। পাত্রীর সন্ধান যে হয়নি তা নয়। শেষজীবনে মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে কবি শুনিয়েছেন এমনই এক কাহিনি– 'একবার আমার একটি বিদেশী অর্থাৎ অন্য Province-এর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। সে এক পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে, জমিদার আর কি, বড় গোছের। সাত লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী সে। আমরা কয়েকজন গেলম মেয়ে দেখতে। দুটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে বসলেন, সুন্দরী, তেমনি চটপটে। চমৎকার তার স্মার্টনেস। একটু জড়তা নেই, বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ। পিয়ানো বাজানো ভাল, –তারপর মিউজিক সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হল। আমি ভাবলুম এর আর কথা কি? এখন পেলে হয়! –এমন সময় বাড়ির কর্তা ঘরে ঢুকলেন। বয়েস হয়েছে, কিন্তু সৌখীন লোক। ঢুকেই পরিচয় করিয়ে দিলেন মেয়েদের সঙ্গে, –সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন– 'Here is my wife' এবং জড়ভরতটিকে দেখিয়ে 'Here is my dauhter!' আমরা আর করব কি, পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে চুপ করেই রইলুম; আরে তাই যদি হবে তবে ভদ্রলোকদের ডেকে এনে নাকাল করা কেন! যাক্, এখন মাঝে মাঝে অনুশোচনা হয়! ...যাহোক্, হলে এমনই কি মন্দ হত। মেয়ে যেমনই হোক না কেন, সাত লক্ষ টাকা থাকলে বিশ্বভারতীর জন্যে তো এ হাঙ্গামা করতে হত না। তবে শুনেছি মেয়ে নাকি বিয়ের বছর দুই পরেই বিধবা হয়। তাই ভাবি ভালই হয়েছে, কারণ স্ত্রী বিধবা হলে আবার প্রাণ রাখা শক্ত...।'

অবশেষে পাত্রীর সন্ধান মিলল যশোর থেকে। ঘটকালি করলেন রবীন্দ্রনাথের মামা ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পিসিমা আদ্যাসুন্দরী দেবী। মজার কথা হল রবীন্দ্রনাথের মামাবাড়ি যশোরে, দেবেন্দ্রনাথেরও তাই। আরও বিশদে বলতে গেলে ঠাকুরবাড়ির অধিকাংশ বধূই এসেছেন যশোর থেকে। আসলে 'পিরালী' বংশের ঠাকুরপরিবারের পাত্রের জন্য 'পিরালী' গোষ্ঠীর পাত্রীই খুঁজতে হত আর যশোর ছিল 'পিরালী' সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল। যশোরের দক্ষিণডিহির ফুলতলা গ্রামের বেণীমাধব রায়চৌধুরী ও দাক্ষায়নী দেবীর বড়ো মেয়ে ভবতারিণী ওরফে ফুলির সঙ্গে বিয়ে ঠিক হল রবীন্দ্রনাথের। এই বেণীমাধব ছিলেন জোড়াসাঁকো কাছারিরই একজন কর্মচারী। রায়চৌধুরী পরিবারের পুরোনো কাগজ ঘেঁটে দেখা গেছে ভবতারিণীর জন্ম ১৯৭৪ সালে ১ মার্চ।

বিবাহের মতো গুরুতর ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার আগে আমরা বরং দেখে নেব কয়েকশো মাইল তফাতে বয়ে চলা পৃথক দুটি জীবনের ধারা, যারা ১৮৮৩ সালে ৯ই ডিসেম্বর থেকে মিলে গিয়ে একটি স্রোতের চেহারা নেবে। সেই সঙ্গে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কেন বলেছিলেন –'এক পিরালীত্ব ছাড়া ঠাকুরপরিবার ও রায়চৌধুরী পরিবারের মধ্যে কোনও মিল ছিল না।' ভবতারিমীর মুখে যখন কথা ফোটেনি রবীন্দ্রনাথ তখন গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুশীলনে ম্যাকবেথের বাংলা অনুবাদ করছেন, প্রস্তুতি নিচ্ছেন হিন্দুমেলার নবম বার্ষিক উৎসবে স্বরচিত কবিতা পাঠের। ভবতারিণী যখন মাটির আঙিনায় টলোমলো পায়ে হাঁটছেন, রবীন্দ্রনাথ তখন ঘোড়া ছোটাচ্ছেন শিলাইদহে, হাতির পিঠে চেপে জ্যোতিদাদার সঙ্গে যাচ্ছে বাঘশিকারে। গ্রামের একমাত্র পাইমারি পাঠশালায় ভবতারিণী যখন শিক্ষারম্ভ করছেন, রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেত থেকে ফিরে আসছে কিছুটা 'Extrovert' এক আধুনিক যুবক হয়ে।

যতই আর্থিক বা সামাজিক ব্যবধান থাক দুই পরিবারের, বিয়েতে মহর্ষি কিন্তু ত্রুটি রাখলেন না কোনো। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের গায়েহলুদ হয়ে গেছে, তিনি রীতি মেনে আইবুড়োভাত খেয়েছেন অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে। আশীর্বাদরূপে শাড়ি-গয়না-খেলনা ও প্রচুর মিষ্টি পাঠানো হয়েছে ফুলতলায়। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী বিয়ে হল ব্রাহ্মমতে ও কন্যা আহ্বানে অর্থাৎ কন্যাপক্ষ এসেছিল মহর্ষিভবনে। কলকাতায় কন্যাপক্ষের জন্য বাড়ি ভাড়া করা এবং যাতায়াতের রাহাখরচটুকু বহন করা হয়েছিল ঠাকুরপরিবারের তহবিল থেকেই। বিয়ে উপলক্ষে হীরে কেনা হয় ১৭১২ টাকা ১ আনার। নববধূর জন্য শাল, চেলি এবং গরদ কেনা হয় যথাক্রমে ১৭৫ টাকা, ৭০ টাকা ও ৩০ টাকার। কন্যাপক্ষের প্রণামী বাবদ খরচ হয়েছিল ৯৬ টাকা, পুরোহিতকে দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল ৮ টাকা। মোট খরচের পরিমাণ ৩২৮৩ টাকা ৩ পাই। মহর্ষি নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন চারটি মোহর দিয়ে। নববধূ আর একটা আশির্বাদ পেলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে, নতুন নাম – 'মৃণালিনী'।

এবার শুরু হল বালিকাবধূর তালিম, যাতে ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য মহিলাদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেন তিনি। মহর্ষির নির্দেশে ১৮৮৪

সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মৃণালিনী দেবীর স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা হল লরেটো হাউসে, কেনা হল স্লেট ও স্কুলের পোশাক। বিয়ের একমাস পর মেজবউঠান জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে তাঁদের লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে চলে গেলেন তিনমাসের মধ্যে নতুন বউঠানের মৃত্যু তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনলো জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। এই সময় মৃণালিনী দেবীর জন্য দর্শনী নামে এক দাসী নিয়োগ করা হয়। ১৮৮৪ সালের আগস্ট মাস থেকে তাঁর জন্য ২৫ টাকা এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ১০০ টাকা। বোঝা যায় মহর্ষির যথেষ্ট প্রিয়পাত্রী ছিলেন মৃণালিনী। ১৮৮৫ সালের শেষদিকে সম্ভবত সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ায় স্কুলশিক্ষায় ইতি ঘটে তাঁর। তখন রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় মৃণালিনীর জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। রামায়ণের সংস্কৃত শ্লোক বাংলায় ব্যাখা করতেন তিনি, ছাত্রী সেগুলি টুকে রাখতেন খাতায়। মৃণালিনী দেবীর সংস্কৃতচর্চায় আর এক উৎসাহী সঙ্গী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ।

আবার একটু পিছিয়ে হদিস নেওয়া যাক কেমন ছিল বিয়ের ঠিক পরেই রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থা। ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রিয় বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে তিনি লিখলেন – 'Honeymoon কি কোনোকালে একেবারে শেষ হবার কোনো সম্ভাবনা আছে – তবে কি না moon –এর হ্রাস বৃদ্ধি পূর্ণিমা অমাবস্যা আছে বটে। অতএব আপনি 'Honeymoon' –এর কোনো খাতির না রেখে হঠাৎ এসে উপস্থিত হবেন।' রক্ষণশীল ঠাকুরবাড়ির সলজ্জ নববধূকে কাছে পাওয়া সেযুগে বড়ো একটা সহজ ছিল না। সেই সময়ের কিছুটা আভাস পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ দেন তাঁর 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতায়–

বাসরশয়ানে
বর। ... তোমার অপার প্রেমপারাবার,
জুড়াইতে আমি এনু তাই।
বলো একবার, 'আমিও তোমার,
তোমা ছাড়া কারে নাহি চাই'।
ওঠো কেন, ওকি, কোথা যাও সখী?
কনে। (সরোদনে) আইমার কাছে শুতে যাই।

কখনও কখনও সুযোগ মিলে যেত অবশ্য। তেমনই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন দ্বিপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া স্ত্রী হেমলতা দেবী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসর' রচনায়। ৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩ কলকাতা মিউজিয়াম ও সংলগ্ন স্থানে বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন লর্ড রিপন। প্রদর্শনী শেষের আগের দিনটি অর্থাৎ ১৮৮৪ সালের ৯ মার্চ নির্দিষ্ট ছিল দেশীয় মহিলাদের জন্য। সম্ভবত সেইদিন পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলেন মৃণালিনী দেবী। সেখানে রবীন্দ্রনাথের আকস্মিক প্রবেশ এবং স্ত্রী'কে দেখে তিনি গেয়ে উঠলেন–

'হৃদয়কাননে ফুল ফোটাও,
আধো নয়নে সখি, চাও চাও–
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসো হে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গানটি হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ উপলক্ষ্যে অভিনীত গীতিনাট্য 'বিবাহ-উৎসব -এর জন্য কিছুকাল আগেই রচিত।

তবে বিচক্ষণ রবীন্দ্রনাথ বুঝে নিলেন গ্রামের সাধারণ সংসারী মেয়েটি কোনোদিন হয়ে উঠবেন না জ্ঞানদানন্দিনী, কাদম্বরী বা ইন্দিরা। তাই সৃষ্টির জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে কবি মৃণালিনী দেবীকে দিলেন আপন সংসারের ভার। বহুদিন পর মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে অকপটে বলেছেন সেকথা– 'তোমাদের এখনকার মত আমরা এত বড়মানুষ ছিলাম না। এখন তো তোমাদের দেখি কিছুতেই কুলোয় না। আমার বরাদ্দ ছিল ২০০ কী ২৫০ টাকা। তাই এনে ছোটবৌকে দিয়ে দিতুম, ব্যস্। তিনি যা খুশি করতেন, সংসার চালাতেন। আমার সেদিকে কখনো কিছু ভাবতে হত না।' এদিকে বিয়ের মাত্র চারমাসের মাথায় নতুন বউঠানের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তেতলার বাইরের বারান্দায় শুতেন, কখনও বই কিনতে চলে যেতেন ধুতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর ও পায়ে একজোড়া চটি পরে। এমনকি বেশ কিছুদিন আমিষ আহার আহার ছেড়ে দিয়ে শারীরিক অবস্থার অবনতিও হয় তাঁর। অথচ এই সময় যে জায়গাটা অনায়াসে নিতে পারতেন মৃণালিনী দেবী, সেটা ধীরে ধীরে দখল করলেন ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী। কৃষ্ণ কৃপালনী লিখেছেন– 'Who [his niece Indira] seems to have partially replaced his deceased sister-in-law as his chief confordante...।'

ইতিমধ্যে প্রথম সন্তান মাধুরীলতার জন্ম হয়েছে। বাসস্থান বদলে কবির নতুন ঠিকানা এখন ৪৯ নং পার্কস্ট্রিট। ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ মহর্ষিভবনে অভিনীত হয়েছে বাল্মীকিপ্রতিভা। ১৮৮৭ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখিসমিতি' ও 'শিল্পমেলা'র কর্ত্রীসভার সখীরূপে নির্বাচিতা হলেন মৃণালিনী দেবী। এই ঘটনা প্রমাণ করে কেবলমাত্র অন্তঃপুবাসিনী সংসারী মহিলা ছিলেন না তিনি। একটু বিশদে বলা যাক। বঙ্গদেশীয় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মহিলা শাখার সভানেত্রী ছিলেন স্বর্ণকুমারী। সোসাইটির মহিলা শাখা উঠে গেলে সম্পাদক মহিলা সদস্যদের নিয়ে ১৮৮৬ সালে সখিসমিতি স্থাপন করেন তিনি। 'সখিসমিতি' নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। অসহায় বঙ্গবিধবা ও অনাথা বঙ্গকন্যাদের সাহায্য করা এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁদের সুশিক্ষিত করে উপযুক্ত বেতনসহ তাঁদের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ছিল সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। 'সখিসমিতি'র উদ্যোগে একাধিকবার মহিলা শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয় বেথুন স্কুলের ভেতরের উঠোনে, যেকানে ক্রেতা, বিক্রেতা ও দর্শক সকলেই মহিলা। 'মায়ার খেলা' প্রথমবার অভিনীত হয় 'সখিসমিতি'রই সাহায্যার্থে।

শিশুকন্যা, স্ত্রী-সহ পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের একটা বড়ো দল নিয়ে দার্জিলিঙের কাসলটন হাউসে কিছুদিন থেকে এলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর ১৮৮৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ সপরিবারে পাড়ি দিলেন গাজিপুরে। আফিম বিভাগের পূর্বপরিচিত কর্মচারী গগনচন্দ্র রায় বাসা ঠিক করে দিলেন। পরিবারের নিবিড় সান্নিধ্য এখানেই প্রথম লাভ করলেন রবীন্দ্রনাথ। তিন মাসে 'মানসী'র অন্তত ২৮টি কবিতা এখানে বসে রচনা করলেন কবি। রোজ বিকেলে পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে চলে বেড়াতে যাওয়া হত। বাড়ির কাছেই লর্ড কর্নওয়ালিসের সমাধি উদ্যান প্রাত্যহিক দ্রষ্টব্যস্থল ছিল তাঁদের। এই বছরের শেষদিকে জন্মালেন প্রথম পুত্র রথীন্দ্রনাথ।

১৮৮৯ সালটা কবি ও কবিপত্নী, উভয়ের কাছেই স্মরণীয়। ওই বছরের ১৫ জুন ঠাকুর পরিবারের জমিদারির দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। ঠিক তার পরের মাসে অর্থাৎ ৩১ জুলাই শান্তিনিকেতনের আশ্রমের ট্রাস্টিরূপে দায়িত্বগ্রহণ করছেন তিনি। ওই বছরের পুজোর ছুটিতেই সদ্যপ্রকাশিত 'রাজা' ও রানী' নাটকের প্রথম মঞ্চাভিনয়ে ছুটিতেই সদ্যপ্রকাশিত 'রাজা ও রানী' নাটকের প্রথম মঞ্চাভিনয়ে 'নারায়ণী'র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মৃণালিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বির্জিতলাওয়ের বাড়িতে। 'বিক্রম', 'সুমিত্রা' ও 'দেবদত্ত'র চরিত্রে রূপদান করেছিলেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জমিদারি পরিদর্শনের কাজে প্রথমবার সপরিবারে শিলাইদহে পাড়ি দিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ সালের ২৫ নভেম্বর, সঙ্গী ছিলেন বলেন্দ্রনাথ। কবি প্রিয় 'পদ্ম' বোটে আশ্রয় নিলেন তাঁরা। কবি জমিদারির কাজে যখন ব্যস্ত থাকতেন তখন বোটে বসত বাউলগানের আসর, কখনও ফকির ফিকিরচাঁদের গান, কখনও বা সুনা - উল্লার গান। পরবর্তীকালে পারিবারিক খাতায় বলেন্দ্রনাথ টুকে রেখেছেন সেখানে শোনা ১২টি গান, উল্লেখ করেছেন গান শুনে খুশি হয়ে কাকিমার শাড়ি দান করার কথাও।

মুখে রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন– 'স্ত্রী'র অভ্যাস বড় বিশ্রী অভ্যাস, একবার হলে আর রক্ষে নেই...', সে অভ্যাস যে ক্রমশ তাঁকে গ্রাস করছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় চিঠিপত্রের প্রথম খন্ডের ৩৬টি চিঠিতে। চিঠির প্রাপকের নাম যেমন বদলেছে 'ভাই ছোট বউ' থেকে 'ভাই ছোট গিন্নি' হয়ে 'ভাই ছুটি'; তেমনই প্রেরক কখনও 'শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', কখনও 'রবি', আবার কখনও 'তোমার রবি'। চিঠির ভাষাও বুঝিয়ে দেয় ওপারের মানুষটি গ্রাম থেকে আসা ছোটো মেয়েটি থেকে ধীরে ধীরে পালটে গেছেন পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রীতে। যেমন বিলেত যাওয়ার সময় 'ম্যাসানিয়া' জাহাজ থেকে লিখছেন– 'আমাদের জাহাজটা এখন্ ডান দিকে গ্রীস্ আর বাঁ দিকে একটা দ্বীপের মাঝখান দিয়ে চলেছে। দ্বীপটা খুব কাছে দেখাচ্ছে– কতগুলো পাহাড়, তার মাঝে মাঝে বাড়ি, এক জায়গায় খুব একটা মস্ত শহর– সমুদ্রের ঠিক ধারেই নীল পাহাড়ের কোলের মধ্যে সাদা শহরটা বেশ দেখাচ্ছে। তোমার দেখতে ইচ্ছে করছে না ছুট্‌কি? তোমাকেও একদিন এই পথ দিয়ে আস্‌তে হবে তা জান? তা মনে করে তোমার খুসি হয় না?' আবার সাজাদপুরের বৃদ্ধ গণৎকার যখন রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে জানিয়েছেন কবির আয়ু ষাট-বাষট্টি বড়োজের সত্তর, তখন তিনি লিখেছেন– 'শুনে তা আমার ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। এই ত সব ব্যাপারে। যা হোক তুমি তাই নিয়ে যেন বেশি ভেবো না। এখনো কিছুনা হোক ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আমার সংসর্গ পেতে পারবে। ততদিনে সম্পূর্ণ বিরক্ত ধরে না গেলে বাঁচি।' ১৮৯৮ সালের জুন মাসে মৃণালিনী দেবীর একটি চিঠিতে কবি জানতে পারলেন সংসারে ঘনিয়েছে অশান্তির কালো মেঘ। উত্তরে তিনি লিখলেন– 'আমি জানি তুমি আমার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছ, এও নিশ্চয় জানি যে আমারই জন্যে দুঃখ পেয়েছ বলে হয়ত একদিন তার থেকে তুমি একটি উদার আনন্দ পাবে। ভালোবাসার মার্জ্জনা এবং দুঃখ স্বীকারে যে সুখ, ইচ্ছাপূরণ ও আত্মপরিতৃপ্তিতে সে সুখ নেই। আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্খা এই, আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক্, আমাদের চতুর্দিক প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হোক্, আমাদের সংসারযাত্রা আড়ম্বরশূন্য এবং কল্যাণপূর্ণ হোক, আমাদের অভাব অল্প উদ্দেশ্য উচ্চ চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য্য আপনাতের কাজের চেয়ে প্রধান হোক্ এবং যদি যা ছেলেমেয়েরাও আমাদের এই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমশ দূরে থেকে চলে যায় আমরা দুজনে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মনুষ্যত্বের সহায় এবং সংসারক্লান্ত হৃদয়ের একান্ত নির্ভরস্থল হয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে অবসান করতে পারি। সেইজন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আস্‌তে এত উৎসুক হয়েছি।'

এই চিঠি লেখার কয়েক মাসের মধ্যে পরিবারের সকলকে শিলাইদহে নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ, কুঠিবাড়িতে সংসার পাতলেন মৃণালিনী। মাত্র দু-বছর পদ্মাপারে ছিলেন তাঁরা; কবি ব্যস্ত থাকতেন জমিদারির কাজে আর সাহিত্যচর্চায়, কবিপত্নী ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংসার সামলাতেন। মৃণালিনী দেবীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার, মিষ্টি আর শরবত নিয়ে নানারকম এক্‌সপেরিমেন্ট করতে ভালোবাসতেন। রবীন্দ্রনাথকে খাইয়ে সুখও ছিল। 'এলোঝেলো' নামের গজা খেয়ে সেটার নাম পালটে করেছেন 'পরিবন্ধ', তাঁর বিচিত্র সব রান্নার আবদার মেটাতে মৃণালিনী দেবীকে বানাতে হয়েছে মানকচুর জিলিপিও। রবিবার বামুন-ঠাকুরদের ছুটি দেওয়া হত, সেদিন সব কাজের ভার ছোটোদের। তাদের জন্য চালু হল গৃহবিদ্যালয়। কুঠিবাড়ির সামনের বাগানের দায়িত্ব মা ও শিশুদের। সেই বাগানের খোঁজ নিয়মিত নিতেন রবীন্দ্রনাথ। কখনও কলকাতা থেকে লিখছেন– 'তোমাদের বাগান এখন কি রকম? কিছু ফসল হচ্ছে? কড়াইসুটি কতদিনে ধরবে?' ... আবার কখনও পরিবার যখন কলকাতায় তখন শিলাইদহ থেকে লিখছেন –'তোমার শাকের ক্ষেত্র ভরে গেছে। কিন্তু ডাঁটা গাছগুলো ঘন ঘন হওয়াতে বাড়তে পারছে না... রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, মালতী, ঝুম্‌কো, মেদি খুব ফুট্‌চে... সবাই জিজ্ঞাসা করছে মা কবে আসবেন?

১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদবোধন হল। তার ঠিক একবছর আগের একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনী দেবীকে লিখেছিলেন– 'যদি তুমি আমার সঙ্গে সকল রকম বিষয়ে সকল রকম শিক্ষায় যোগ দিতে পার তা খুসি হই...।' এর পরের ঘটনার একটা ছবি পাওয়া যায় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে –'কলকাতায় মা আত্মীয়স্বজনের স্নেহবন্ধনের মধ্যে একটি বৃহৎ পরিবারের পরিবেশের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে সকলেই ভালোবাসত, জোড়াসাঁকোর বাড়ির তিনিই প্রকৃপক্ষে কর্ত্রী ছিলেন। সেইজন্য কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে এসে থাকা তাঁর পক্ষে আনন্দকর হয়নি। অস্থায়ীভাবে অতিথিশালার কয়েকটা ঘরে বাস করতে হল, সেখানে গুছিয়ে সংসার পাতার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁর নিজের পক্ষে সেটা যতটা কষ্টকর হোক, তিনি সব অসুবিধা হাসিমুখে মেনে নিয়ে ইস্কুলের কাজে বাবাকে প্রফুল্লচিত্তে

সহযোগিতা করতে লাগলেন। তার জন্য তাঁর কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। যখনই বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, নিজের অলংকার একে একে বিক্রি করে বাবাকে টাকা দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত হাতে সামান্য কয়েক গাছা চুড়ি ও একটি চেন ছাড়া আর কোনো গয়না অবশিষ্ট ছিল না। মা পেয়েছিলেন প্রচুর, বিবাহের যৌতুক ছাড়াও শাশুড়ির পুরানো আমলের ভারী গয়না ছিল অনেক। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের খরচ যোগাতে সব অন্তর্ধান হল।' এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতো মিতবাক পুরুষও জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে বলেছেন– 'তিনি তো চেয়েছিলেন আমার শান্তিনিকেতনের কাজে সঙ্গিনী হবার। বিশেষ করে ইদানিং, অর্থাৎ শেষের দিকে তংার একান্ত আগ্রহ হয়েছিল আমার কাজ করবার। কিন্তু সে তো হলো না, অল্প পরেই তাঁর সেই ভয়ানক অসুখ হল'।

কী সেই ভয়ানক অসুখ? এস্টেটের কর্মচারী ও পরবর্তীকালে আশ্রমের শিক্ষক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বঙ্গীয় শব্দকোষ রচয়িতা) কী লিখছেন দেখা যাক– 'ভ্রাতৃভাব শিষ্টাচার সংযম নিয়মানিষ্ঠা বিলাসবর্জন প্রভৃতি আশ্রমের আদর্শভূত সদ্‌গুণে বালকগণকে শৈশব হইতে মানুষ করিয়া গড়িয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি অক্ষুণ্ণভাবে রখা করার নিমিত্ত মৃণালিনী দেবী কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহার তীব্র আঘাত তাঁহার অনভ্যস্ত শরীর সহ্য করিতে পারিল না, ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ দেখা দিল এবং ক্রমে সাংঘাতিক রোগে পরিণত হইল। চিকিৎসার্থে তিনি কলকাতায় নীত হইলেন; সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসায় মারাত্মক রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না।' পরিণত বয়সে রথীন্দ্রনাথের সন্দেহ, রোগটা ছিল অ্যাপেন্ডিসাইটিস যার কোনো চিকিৎসা সেকালে ছিল না। ১৯০২ সালে ১২ সেপ্টেম্বর মৃণালিনী দেবীকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। ডাঃ ডি এন চট্টোপাধ্যায় অ্যালোপ্যাথির পাশাপাশি মৃণালিনী দেবীর চিকিৎসার ভার ছিল ডাঃ জে এন মজুমদার ও ডাঃ ডি এন রায়ের মতো হোমিয়োপ্যাথ ডাক্তারদের উপর। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের হোমিয়োপ্যথি তো ছিলই। কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে গেল। ২৯ অক্টোবর কেনা হল বেডপ্যান, স্টম্যাক টিউব ইত্যাদি, অর্থাৎ মৃণালিনী দেবী বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা হারালেন। তাঁকে শেষ শয্যা পাতা হল লালবাড়ির দোতলায়।

প্রায় দু-মাস শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি, শেষ দিকে নার্সের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শোনা যায় বিদুৎহীন সেই ঘরে সারারাত স্ত্রীকে হাতপাখার বাতাস করতেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সময় তাঁর হয়তো মনে পড়েছিল ১৮৯০ সালে ২৯ অগস্ট জাহাজ থেকে মৃণালিনী দেবীকে লেখা চিঠির কথা– 'আমাদের জাহাজে দুটো তিনটে ছোট ছোট মেয়ে আছে– তাদের মা মরে গেছে, বাপের সঙ্গে বিলেত যাচ্ছে।' বেচারাদের দেখে আমার বড় মায়া করে। তাদের বাপটা সর্ব্বদা তাদের কছে কাছে নিয়ে বেড়াচ্চে– ভাল করে কাপড় চোপড় পরাতে পারে না, জানে না কি রকম করে কি করতে হয়'...২২ নভেম্বর মার শয্যার পাশে বসে তাঁকে শেষবারের মতো দেখলেন রথীন্দ্রনাথ–'তখন তাঁর বাক্‌বোধ হয়েছে। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে কেবল নীরবে অশ্রুধারা বইতে লাগল।' সেই ভয়ানক যন্ত্রণা নিয়ে আরও এক সপ্তাহ বেঁচে ছিলেন মৃণালিনী দেবী। ২৯ নভেম্বর ১৯০২ রবিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস পড়ল তাঁর। দাম্পত্যজীবনের উনিশ বছর পূর্ণ হতে মাত্র সতেরো দিন বাকি ছিল আর শেষ মুহূর্তে হয়তো তিনি দেখতে পেয়েছিলেন বাসরঘরে লজ্জায় জড়োসড়ো সেই গ্রাম্য বধূটিকে যার সামনে বসে রবীন্দ্রনাথ দুলে দুলে গাইছেন–

'নেহারিয়া রূপ হায়,
আঁখি না ফিরিতে চায়,
অপ্সরা কি বিদ্যাধারী
কে রূপসী নাহি জানি।'

সেটাও ছিল এক রবিবার।

আর রবীন্দ্রনাথ? জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে তিনি বললেন– 'এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়। সংসারে কথার পুঞ্জ অনবরত জমে উঠতে থাকে, ঠিক পরামর্শ নেবার জন্য নয়, শুধু বলা, বলার জন্যই। এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব বলা যায়, –সে তো আর যাকে তাকে হয় না।'

তার কিছুদিন বাদেই শেষ হবে তাঁর এক থাকা হয়তো বহুদিন বাদে উত্তর পাবেন সেই প্রশ্নের–

'আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে–
হে কল্যাণী, গেলে যদি, গেলে মোর আগে,
মোর লাগি কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যা - তরে?'